Invited Commentary
Journal of Journalism and Media (2026), Vol. 8, No. 1, pp. 111-118
DOI: https://doi.org/10.59185/jjm.v8i1.558

মুম্বই চলচ্চিত্র কারখানার স্রোতবিরুদ্ধ সাংস্কৃতিক এজেন্ডা[১]

মানস চৌধুরী
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

পঞ্চাশ ষাটের দশকে মুম্বই চলচ্চিত্র কারখানাকে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটা ননশালান্ট/নির্লিপ্ত বিরুদ্ধাচারী হিসেবে দেখতে আমি ইচ্ছুক। এজন্য প্রথমে আমাদের মাথায় রাখা দরকার পঞ্চাশ ষাট দশকের উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা। আর সাধারণভাবে মাথায় রাখা দরকার সংস্কৃতি-কারখানার বৈশিষ্ট্য। কোনো কারখানার মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রাখবার প্রসঙ্গ এটা। সেসূত্রে কয়েকটা সম্পর্কিত অথচ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ পাশাপাশিই বলে শুরু করছি। কারখানা মাত্রই লোকজন জড়ো হন সেখানে, এবং তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের। সেখানে 'শ্রমিক' নিযুক্ত হন, ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন, শ্রমব্যবস্থাপক বা লেবার-কনট্রাকটরবৃন্দ হাজির হন। লগ্নিকারী তো সেখানে আসেনই। এই পদপ্রত্যয়গুলো কমবেশি মার্কসবাদী অনুশীলনে পরিচিত।

পাশাপাশি, নগরায়ন বা আর্বানাইজেশনের প্রসঙ্গকে বিবেচনায় রাখছি। প্রাসঙ্গিক একটা উদাহরণ হিসেবে কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। কলকাতা অপেক্ষাকৃত নবীন শহর বলেই কেবল নয়, অধুনা কলকাতাতে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব এবং তাদের ব্যবসাতে নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে একটা বিশাল রাজনৈতিক বিতর্ক বা সংঘর্ষ আছে বলে উদাহরণটাকে বাছাই করলাম।[২] কলকাতায় আমার গুটিকয় যেসব বন্ধুর সাথে কথা হয়, তাঁদেরকে একাধিকবার বলেছি। কথাগুলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ না-করাতে হয়তো অত গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা শোনেননি। কেন ও কীভাবে কলকাতাতে বিভিন্ন জাতির, ভাষার অস্তিত্বের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করাকে আমি একটা সমস্যাজনক বিষয় হিসেবে দেখি। নগরায়নের প্রসঙ্গটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শহরটা তৈরিই হয়েছে কলোনিয়াল রাষ্ট্র পরিচালনার রাজধানী হিসেবে। রাজধানী বা যেকোনো কেন্দ্রীয় একটা নগরেই এটা ঘটবার কথা। সেখানে বিভিন্ন রকমের লোকজন যে জড়ো হবেন। বাণিজ্যের স্বার্থে জড়ো হবেন, ক্ষুদ্র বাণিজ্যের জন্য জড়ো হবেন, শ্রমবিক্রির 'স্বার্থে' জড়ো হবেন। নগরের তো বটেই, এমনকি যেকোনো একটা হাটেরও তাই বৈশিষ্ট্য। নগরায়নের আরেকটা জরুরিত্ব হচ্ছে এখানে কারখানা বসে। কারখানার সাধারণ পুঁজিবাদী প্রবণতা হচ্ছে, এখানে সস্তায়-সুলভতায়, প্রয়োজনে মানুষ জড়ো হন। শ্রমিকের প্রান্ত থেকে দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন মেটাতে জড়ো হন।

যোগাযোগঃ manosh@juniv.edu

নানাবিধ কারক জড়ো হওয়া কারখানার একটা সাধারণ বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্য। কোনো বিশিষ্টতা নেই। লগ্নিকার, ব্যবস্থাপক, শ্রম-ব্যবস্থাপক, শ্রমিক যেমন জোটেন, তেমনি বহুবিচিত্র খরিদ্দারও জোটেন। যার কলকাতাতে কিছু নেই, তিনিও কলকাতাতে বা যেকোনো শহরে আসবেন কিছু-না-কিছু কিনতে। সাধারণ পণ্য-ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্প উৎপাদনের কারখানার সাথে সংস্কৃতি-উৎপাদন কারখানার পার্থক্যটা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়। এগুলো আলোচনাও হচ্ছে এক-দেড়শো বছর ধরে, বিশেষভাবে তো গত সত্তর বছর বটেই। তো, কালচার-ইন্ডাস্ট্রি বা সংস্কৃতি কারখানার বিষয়টাও ওরকম যে, এখানে প্রাযুক্তিক নিরন্তর-উৎকর্ষের প্রসঙ্গ আছে এবং অবশ্যই পাশাপাশি নানাবিধ জায়গা থেকে মানুষজন জড়ো হওয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে। জরুরি অনেকের জানা থাকা সত্ত্বেও দুটো পটভূমি বলে নিচ্ছি। ব্রিটিশ কোম্পানি ইএমআই, যেটাকে আমরা এইচএমভি নামে চিনি, তারা ব্রিটেনে একটা টেকনোলজিক্যাল কোম্পানিই ছিল আদিতে। তারপরে সেটা ভারতে আউটলেট বসানোর সময়কালটাতে শ্রুতিপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটছিল। সেই কোম্পানির একটা ব্র্যান্ড হচ্ছে এইচএমভি, যা অধুনা বিবর্তিত হয়ে সারেগামা হয়েছে। ভারতে এই শ্রুতিপ্রযুক্তিকেন্দ্রিক কোম্পানিটার আদি প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। এই কারখানাটাই ধীরে ধীরে মুম্বইয়ে বিকশিত হয়, বলা চলে কেন্দ্রবদলই ঘটে। মুম্বই চলে যাবার কারণে কলকাতারটাও বন্ধ হয়ে যায় না। কলকাতা আরেকটা এবং প্রাচীনতর কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকে। তবে কলকাতা যখন একমাত্রপ্রায় কেন্দ্র ছিল এই সংগীত কারখানাটির, তখন একে প্রযুক্তির বিকাশ প্রসঙ্গের বাইরে বোঝা যাবে না। আমরা চলতি ভাষায় বলি কলের গান বা গ্রামোফোন। সদ্যলব্ধ প্রযুক্তিতে নতুন ম্যানুফ্যাকচারড প্রোডাক্টকে ঘিরে নানাবিধ কারক সম্পর্কিত থাকেন। সেখানেই আসে আরেকটা পটভূমি।

সংস্কৃতি-কারখানাতেও শিল্প-কারখানার মতোই চারপাশ থেকে মানুষজন জড়ো হয়েছেন। তা তিনি কুচবিহারের আব্বাসউদ্দিন হোন, ত্রিপুরার শচীনদেব বর্মন হোন, কিংবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্মলেন্দু চৌধুরী হোন। হাওড়ার কাননবালা হোন, চুরুলিয়ার নজরুল ইসলাম হোন, বা অমৃতসরের ইন্দুবালা হোন। যাঁরা আরও গভীরতর সংগীতের ইতিহাস জানেন তাঁরা আরও সহজে এই বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করতে পারবেন। গুগলও কিছু ভুলভালসমেত অনেককিছুতে সাহায্য করতে পারে। সংগীতের ম্যানুফ্যাকচারিং ইতিহাসটা ধরে যদি আমরা আগাতে থাকি, তাহলে আমরা দেখতে পারব এখন থেকে একশো বছর আগে এইচএমভি বলে যা আমরা চিনি, শ' খানেকের কিছু বেশি বছর আগে যা ইএমআই নামে ব্রিটেনে ছিল,[৩] তার কোলকাতীয় শাখা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে লোকজন জড়ো হতে থাকলেন। জড়ো করা হতে থাকল। তাই তো হবার কথা।

'নিমাই দাঁড়া রে' গানটার কথা মনে পড়ছে। অনন্তবালা বৈষ্ণবী গেয়েছিলেন।[৪] স্টুডিওতে গিয়ে গাইবার আগে তিনি নিশ্চয়ই পথে-প্রান্তরে বা কোনো জনপদেই গাইতেন

হয়তো। হয়তো সঙ্গীত আয়োজক কারোর চোখে পড়েছেন তিনি। এই সঙ্গীত-আয়োজককে নতুন কালে মিউজিক-অ্যারেঞ্জারই বলা হয়ে থাকে। অনন্তবালাকে কীভাবে গানের কারখানাতে যুক্ত করা হয়েছে বাস্তবে তা আমি জানি না। তাঁর এবং প্রথমভাগের নানান শিল্পীকে খুঁজবার ও কারখানাতে যুক্ত করবার প্রক্রিয়া নিয়ে স্বতন্ত্র অনুসন্ধান চিত্তাকর্ষক হবে। সেটা আমি করিনি, আমি অ-নাগরিক একটা গানের, সম্ভবত অ-নাগরিক এক শিল্পীকে, কারখানার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে মনশ্চক্ষে দেখতে চেষ্টা করলাম; এবং খুব একটা ভুল তাতে ঘটেনি। গানটা প্রায় নিখিল বঙ্গীয় হিট হয়। বর্তমানে দুই বাংলার এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে এই গানটা বাজেনি। যাঁদের বাজানোর সামর্থ্য ছিল, কোনো না কোনো উছিলায় ওই চাকতিতে, লং প্লেতে, তা বাজিয়েছেন। গানটা রেকর্ডবন্দি হবার বহু বছর পরে, ধরা যাক ছিয়াত্তর থেকে আটাত্তর সালের কোনো একটা সময়ে বাংলাদেশের একটা প্রত্যন্ত শহরের পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামে বিয়েবাড়ি বা আর কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বাজতে শুনেছি আমি। এসব অনুষ্ঠানে বিনোদন-ফূর্তির অংশ হিসেবে বাঁশের মাথায় চোঙ্গামাইক বাজানোর রেওয়াজ ছিল এবং ভাড়ায়-আনা সেসব মাইকে যেসব গান বাজত, রাত্রিবেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই মাইক থেকে যেসব গান কানে আসতো, তাতে সন্ধ্যা বা হেমন্ত যদি থেকে থাকেন, অনন্তবালার এই গানও থেকেছিল। কলকাতা উৎসারিত নন, হয়তো আনুষ্ঠানিক সাংগীতিক তালিমপ্রাপ্তও নন, এমন এক শিল্পী সম্প্রচারিত হতে-হতে মেহেরপুরের একটা আধাশহুরে পল্লীতে কোনো একটা সামাজিক উৎসবে মাটি থেকে ২০-২৫ ফুট উঁচুতে চোঙ্গামাইকে বাজছেন। উঁচুতে কারণ আয়োজক চাইছেন অন্যরাও এই সঙ্গীত শুনুন। এগুলো সাংস্কৃতিক কারখানারই বৈশিষ্ট্য।

সংগীত কারখানা দিয়ে শুরু করলেও উল্লেখ্য যে, মুম্বই চলচ্চিত্র কারখানা একটা বিচিত্র-বহুমুখী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কারখানা, যেখানে খোদ চলচ্চিত্র কারখানাটাই সংগীত কারখানার পরিপূরক। বিশ্বের অন্যান্য চলচ্চিত্র কারখানার সাপেক্ষে মুম্বই চলচ্চিত্র কারখানাটাকে দেখতে হবে যুগপৎ সংগীত কারখানা হিসেবেও বটে। এটা 'উপমহাদেশের' ছায়াছবির বিশিষ্ট ইতিহাসের ও প্রবণতার সাথে সম্পর্কিত। মুম্বই একাধারে সংগীত এবং সিনেমা কারখানা, দুটোরই পীঠস্থান, যেহেতু ছায়াছবির প্রসঙ্গটা শুরু থেকেই সাংগীতিক প্রসঙ্গ। এই কারখানায় চেন্নাইয়ের শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ থেকে শুরু করে লক্ষ্ণৌয়ের বংশীবাদক, কিংবা এলাহাবাদের সন্তুর বাদক সকলেই সংযুক্ত হয়েছেন। কেবল প্রথম তিন-চার দশকের সুরকারদের প্রোফাইলে মনোযোগ দিলেও সন্নিবেশনের প্রবণতাটা দেখতে পাব। দেশবিভাগের পরের প্রবণতার দিকেও যদি তাকাই, বৃহত্তর যে উপমহাদেশ, সেখানে হেন কোনো অঞ্চল নাই যেখান থেকে লোকজন চলচ্চিত্র কারখানায় জড়ো হন নাই। সন্নিবেশনটাকে কারখানারই বৈশিষ্ট্য বলছি। বলাই বাহুল্য, অনেকে ওই শাস্ত্রীয় রাস্তা ত্যাগ করতে চান নাই। আবার অনেকে এক্সেলেন্স থাকা সত্ত্বেও কারখানায়

সফল হন নাই। সেগুলো তো যে কোনো বাণিজ্য বা কারখানারই সাধারণ বাস্তবতা। এই আচমকাপনা বা এবরাপশন যেকোনো কারখানাতেই থাকে।

সাত রকম জর্দা বা গুটখা বাজারে বিকোতে শুরু করলে একটা বা দুটো টেকে। মুম্বইয়ে অনেকে আসেননি সনাতনী ঘরানার প্রতি আনুগত্যের কারণে। কেউ এসে সফল হয়েছেন, অন্য কেউ সফল হন নাই। একাধিকবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজে, ও তাঁর পরিবারের লোকজন আরো বেশি বলেছেন যে মুম্বইয়ে তাঁর সাথে সঠিক আচরণ হয়নি। আমার বিবেচনায়, এগুলো নিছকই অভিমান মাত্র। যে কয়দিন তিনি তারকা ছিলেন, বিপুল তারকাই ছিলেন। অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিতের মতো তিনি অতটা মুম্বই-নিবিষ্ট ছিলেন না। সলিল চৌধুরীর ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। তিনি মুম্বইয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও মাঝেমধ্যেই, কলকাতাতে বা বাংলায় মিউজিক রিলিজ করছিলেন। দুই ভাষার সাথে যোগাযোগের একটা সমান্তরাল পদ্ধতি তিনি বানিয়েছিলেন। সেটা তাঁর রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকেও আসতে পারে। তবে এগুলো যদি-কিন্তুর প্রসঙ্গ। কারখানাতে কাউকে ডাম্প করার অনুভূতিটা গুরুত্বপূর্ণ, তবে কারখানার সাফল্যের বিষয়টাকে আরবিট্রারি প্রবণতা হিসেবেও দেখি আমি। বরং প্রসঙ্গটা এরকম যে বাংলা থেকে যাওয়া সুরকার-গায়ক হেমন্তকুমারও একজন সফল তারকা ছিলেন।

ভারতের বাঙালি অনেকেরই যত অভিমান থাকুক, মুম্বই ইন্ডাস্ট্রির বৈশিষ্ট্যবিচারে পরিস্থিতিটা আরও পরিব্যপ্ত। চিত্রনায়কদের বিশেষ সুবিধা হয়নি, কিশোর কুমার, অশোক কুমার বা জয় মুখোপাধ্যায় ছাড়া। নায়িকাদের মধ্যে তো শর্মিলা ঠাকুর বা জয়া ভাদুড়ি মহাতারকা ছিলেন। সুর ও সঙ্গীতজগতে তালিকাটা রীতিমত ব্যাপক। জটিল ভাষা-জাতিগত পরিচয় এড়িয়েও বলা যায় যে এই তালিকায় বাপ-বেটা দুই দেববর্মণকেও রাখতে হবে। বিস্তর আলাপসাপেক্ষ প্রসঙ্গ এটা। কারখানায় তো আর মেপে-মেপে হয় না অংশগ্রহণ। একদম হিন্দি বলতে পারেন না এমন দক্ষিণের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হয়তো জানতেনই না কী সংলাপ বলছেন। একটা রাফ স্ক্রিপ্টে থিমেটিক একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে কাজ করে গেছেন তিনি। যথাসম্ভব ঠোঁট মেলানোর চেষ্টা করেছেন। একাধিক ভাষাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির ক্ষেত্রে এমনকি ঠোঁট মেলানোর চাপও আদিকালের ছায়াছবিতে ছিল না। হিন্দি জানেন এমন একজন স্টুডিওতে বসে-বসে স্বরসংযোগ ঘটাচ্ছেন। কারখানা মানেই এরকম মহাখিচুড়ির আয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম বা প্রযুক্তি উভয় হিসেবেই এই ধরণের সংকলন ঘটানোর মোক্ষম জায়গা।

সাতচল্লিশের রাজনৈতিক ভূমি-বিভাজনের আগেই মুম্বই সংস্কৃতি কারখানার এই বৈশিষ্ট্য। মুম্বই বহুজাতিক, বহুভাষিক, বহু-উৎসের বা ঘরানার শিল্পচর্চাকারীদের অখণ্ড জায়গা হয়ে দাঁড়াল। একটা মিলনস্থল, অনস্ক্রিন তো বটেই, অফস্ক্রিন কর্মকাণ্ডে আরও বেশি। সংগীত বা সুর-সম্পাদনা, চিত্রনাট্য রচনা, গল্প প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিশাল একটা কারখানার নানান টুকরো কাজেই নানান ধরনের মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছেন।

উপমহাদেশের সকল প্রান্ত থেকেই লোকজন এসেছিলেন। আরও নিরীখে, ভূগোলসীমা শুধু এখানেই থেমে থাকে নাই, ব্রিটিশ থেকে শুরু করে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো, সেখান থেকে ইরান সবই আছে। ওদিকে, হেলেনের পরিবার এসেছিলেন বর্মা থেকে, অধুনা যাকে মিয়ানমার বলা হয়, গোলার্ধের আরেক দিক। জেনিফার কাপুরের পরিবার ব্রিটিশ একটা ভ্রমণ নাট্যদল (ট্রাভেলিং থিয়েটার) হিসেবে কাজ করছিলেন। সম্ভবত নিছক রুটিরুজি নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির চেতনার অনুশীলন ছিল এটা। শশী কাপুরের সাথে জেনিফার কেন্ডেলের পরিচয়ও ছিল সেই থিয়েটার সূত্রে। সেটা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা/দেশবিভাগের পরের ঘটনা। উপমহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের নিমন্ত্রণেও আনা হয়েছে। সঙ্গীতে বেশি ঘটেছে, কিন্তু অভিনয়ের বেলাতেও ঘটেছে। ঘটেছে এমনকি নিকট-অতীতে। নুসরাত ফতেহ আলী খানের নাম সকলের মনে পড়বে তাঁর তারকামূল্যের কারণে। তবে তালিকাটা বেশ লম্বা। ভারত সরকারের দিক থেকে রাহাত আলী খানের ভিসার ঝামেলার আগ পর্যন্ত এই প্রবাহটা ছিলই। বাংলাদেশের নাগরিক রুনা লায়লা গেয়েছিলেন। তিনি নাগরিক জগতের শিল্পী। কিন্তু আবার তিরাশির মেগাহিট, *হিরো*-তে, সেখানে সঙ্গীত সম্পাদকদ্বয় লক্ষীকান্ত-পেয়ারেলাল নিয়ে এলেন রেশমাকে, পাকিস্তান থেকে।[৫] পাকিস্তান থেকে নিমন্ত্রণের সংখ্যা নিছক ছিল না।

একটা বড় পটভূমির মধ্যে ছোট যে যুক্তিটা আমি রাখতে চাইছি তা হচ্ছে, সাতচল্লিশের দেশবিভাগ যা সন্দেহাতীতভাবে একটা রাজনৈতিক প্রকল্প, তাকে সংস্কৃতি-কারখানার কারিগরেরা তাৎক্ষণিকভাবে বা অনায়াসে গ্রহণ করতে চাননি। তাঁদের অনেকের তৎপরতা এই রাজনৈতিক ফয়সালা বা রায়ের বিরুদ্ধাচরণের পথও নিয়েছে, যতই কোমল হোক সেসব তৎপরতা।

ব্রিটিশ অধিরাজ ও তার দেশজ মিত্র যাঁরা এই অঞ্চলে রাজনীতি করছিলেন, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গভীরভাবে তাঁদের প্রকল্প ছিল। এখানে রাজনৈতিক তর্ক চলতে পারে কার দায় বেশি ছিল তা নিয়ে। নেহরু নাকি জিন্নাহর নাকি মহাত্মা গান্ধী; নাকি এসবের বাইরে খোদ কমিউনিস্টদের ব্যর্থতা/দুর্বলতা। অজস্র হাইপোথিসিস তৈরি করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্লেষকদের পক্ষপাত থেকেই এসবের পুনর্পাঠ হবে। ইতিহাসে 'কী হতে পারত' ধরণের প্রশ্নগুলো চিরকালই অমীমাংস্য এক বৌদ্ধিক যাত্রা। এখানে মীমাংসার প্রশ্ন সামান্য, বৌদ্ধিক একটা অনুশীলন হিসেবেই কেবল একে দেখা যেতে পারে। বাস্তবতা হলো, এই সাতচল্লিশের দেশবিভাগ ঘটেছে, এবং সহিংসভাবে, রক্তক্ষয়ী হিসেবে। এই রক্তক্ষয়ের হিসাবও হবে পক্ষপাতযুক্ত, অমীমাংসিত। কোন রাষ্ট্রে কোন পক্ষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তা জন-আলাপে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা নেই। পক্ষ কোনটাকে বলা হবে তার বর্গও আলোচকভেদে স্বতন্ত্র হবে। এতদসত্ত্বেও, সকল পক্ষই একটা ব্যাপারে একমত যে, একটা রক্তক্ষয়ী বিচ্ছেদ ঘটেছে।

আমার প্রস্তাবানুযায়ী, সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে গভীর ক্ষতসম্পন্ন যে রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া শেষ হলো, সেই রাষ্ট্রকে অধিগ্রহণের বিষয়টা সংস্কৃতিকর্মীদের জন্য নানাবিধ ছিল। ক্ষত কেবল হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে মানুষ মারা পড়বার, আহত হবার নয়, ক্ষত ছিল নিবাস বাছাইয়েও। চিরচেনা অঞ্চল ছাড়বার বাধ্যবাধকতা। হয়তো মান্টো কোথায় থাকবেন তা ঠিক করবার পরও তাঁর আরেকদিকে যেতে হলো। হয়তো লাহোর থেকে অমৃতসরের দিকে যাচ্ছেন কিষণ চন্দর, মান্টো যাচ্ছেন লুধিয়ানা থেকে লাহোর। জীবিত মানুষদের মৃত মানুষের জন্য শোকের অধিকন্তু বিচ্ছেদের বন্দোবস্ত। এই বিচ্ছেদের মধ্যে কার কেমন ভাবে নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন, নতুন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতিবিদদের গড়ে দেওয়া রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্য, সেই রাষ্ট্রের যে গঠনপ্রণালী ধারণ করেছেন তার নির্দিষ্ট কোনো ব্যাকরণ ছিল না। আবার নবগঠিত রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের প্রতি হিংসাত্মক হতেও সময় লাগেনি। এই পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক (বৃহত্তর অর্থে সাহিত্যিক) প্রতিক্রিয়াগুলো নিছক কারখানার বাণিজ্যিক নিয়মে পরিচালিত হয়নি। সেটাই আমার বলবার জায়গা। সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক চর্চার গভীর পাটাতনকে আমি বিবেচনায় রাখতে চাই: কীভাবে গড়ে-দেয়া-রাষ্ট্রব্যবস্থার বিপক্ষে যেন-বা-ভাবলেশহীন প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাংস্কৃতিক কিছু অভিব্যক্তি দানা বেঁধেছিল। সেই অর্থেই ননশালান্ট বিরুদ্ধচারী বলছি এই প্রবণতাকে। নিজ রাষ্ট্রের প্রতি এটা কোনো সাংস্কৃতিক যুদ্ধঘোষণা ছিল না। তবে যাঁরা এসকল পেশাতে ছিলেন, তাঁদের অনেকের সাংস্কৃতিক স্টেটমেন্ট দেবার আগ্রহ ছিল।

মুম্বই কারখানা যেমন বহু মানুষের সাফল্যের মূল মন্ত্র, তেমনি অনেকের রুটি-রুজির একমাত্র অবলম্বন। কারো কারো পারিবারিক সহায়-সম্পত্তি এতটাই শক্ত যে, বক্স অফিসে পরপর কয়েকটা ছবি মুখ থুবড়ে পড়লেও তাদের কিছু আসে যায় না। যেমন ফিরোজ খান, সেলিম খান, চোপড়া কিংবা কাপুরদের পরিবার। ঐতিহাসিকভাবেই তাঁদের ব্যবসার উৎস স্বতন্ত্রভাবে জোরালো। সবার ক্ষেত্রে তো তা নয়। অনেকের জন্যই এটা ছিল ফার্স্ট জেনারেশন প্রচেষ্টা। মীনা কুমারী বা মুমতাজ, ক্যামেরার সামনে উজ্জ্বল আলোতে দাঁড়ানো ছিল আয়ের একমাত্র অবলম্বন। এই বাস্তবতার ভেতর থেকেই কেউ কেউ মহাতারকা হয়েছেন। কেউ আবার ক্ষয়ে গেছেন, কেউ আধপেটা খেয়ে কিংবা রোমান্টিক দুঃখ-বিলাসিতায় ভুগে মারা গেছেন। এমনকি প্রথম ছবিতেই মারহাবা কুড়ানো 'ভিমি'-র মতো নায়িকার লাশও শেষমেশ ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যেতে হয়েছে।[৬] জয় আর ক্ষয়ের এই নির্মম দোলাচলটা আসলে তারকাপ্রথার কেন্দ্রীয় একটা বৈশিষ্ট্য।

প্রতিপাদ্যটা হচ্ছে, যদিও মুম্বই বা লাহোর কারখানা স্বীয়-স্বীয় রাষ্ট্রের পলিসির বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি, তথাপি সাতচল্লিশের ওই বিবাদময় ও বিষাদকর বিশাল বিচ্ছেদের পর নতুন রাষ্ট্রের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো কিছু প্রবণতা দেখা গেছে। দেশভাগের পটভূমিতে ছিল প্রগাঢ় বেদনা আর রক্তক্ষরণ। সেই ক্ষত

নিরাময়ের জন্যই হোক, সৌহার্দ্য রক্ষার খাতিরেই হোক, কিংবা নিছকই রাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদকে মনেপ্রাণে ধারণ না করার কারণেই হোক, শিল্পীরা বিশেষত নির্মাতা পর্যায়ের দৃশ্যশিল্পীরা নিজ-নিজ সামর্থ্য আর ঝুঁকি নিয়ে নানাবিধ প্রজেক্টে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই আদান-প্রদান অবশ্য ব্রিটিশ আমল থেকেই ছিল, যখন জীবিকার খোঁজে মায়ানমার পর্যন্ত মানুষ ছুটে যেত। দেশভাগের পর কে কোন রাষ্ট্র বেছে নেবেন, তা সবসময় কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে ঠিক হয়নি। মহম্মদ রফি ভারতেই থেকে গেলেন, সুরাইয়া প্রমুখ গেলেন না, আবার নূরজাহান পাকিস্তানে চলে গেলেন। আজকে আমাদের হাতের এই বারো ইঞ্চির স্ক্রিনে বা ল্যাপটপে প্রচুর ডেটা মজুদ আছে বলে এসব খুঁটিনাটি আমরা সহজেই সার্ফ করে পেয়ে যাই। রাষ্ট্র যখন তার স্থূল প্রচারযন্ত্র দিয়ে নতুন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক পরিচয় ভাগ করতে ব্যস্ত, তখন চলচ্চিত্র বা সংগীতের মতো প্রজেক্টগুলোতে সীমানার ওপার থেকে শিল্পীদের যুক্ত করাটা ছিল নির্মাতাদের একটা সজ্ঞান সাংস্কৃতিক অভিপ্রায়। এটাকে আমি বলছি আলগোছে, এক ধরণের 'ননশালান্ট' বিরুদ্ধাচরণ।

সদ্যজাত রাজনৈতিক বিচ্ছেদকে সামলে অখণ্ড একটা সাংস্কৃতিক পারফরম্যান্সের জমিন কল্পনা করার বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধাক্কা দিল পঁয়ষট্টির যুদ্ধ। তবে এরপরও সমকালের সাথে মানানসই ক্রুদ্ধ নিষেধাজ্ঞা ঘটেনি। আটষট্টিতেই লক্ষ্ণৌ উর্দু কবি সম্মেলনে বা চিশতীর দরগাহর মেহফিলে পাকিস্তান থেকে দল বেঁধে মানুষ আসতে শুরু করেছিল। বর্তমানের উগ্র রাষ্ট্রবাদ পরিস্থিতি পুরো বদলে দিয়েছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদকে আমি 'সমর-আকাঙ্ক্ষী উগ্র জাতীয়তাবাদ' বলতে পছন্দ করি, কারণ এতে রাষ্ট্রের হিংস্র ভঙ্গিটা স্পষ্ট হয়, থিওলজিক্যাল পরিচয়ের খোসাতে চালিকাশক্তি কম আড়াল হয়। রাহাত ফাতেহ আলী খানের সাথে যা ঘটল তা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি মকবুল ফিদা হুসেনের মতো মানুষ, যিনি সিনেমার হোর্ডিং এঁকে জীবন শুরু করেছিলেন এবং শেষ জীবনে ছবি বানিয়েছিলেন, তাঁকেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হলো। আজকের এই মিলিটারিস্টিক ইন্ডিয়া নাগরিকদের যেভাবে প্রতিবেশীর দিকে হিংস্র চোখে তাকাতে শেখায়, পঁয়ষট্টির যুদ্ধের পরেও তা কল্পনা করা যেত না। অথচ এই সংস্কৃতি-কারখানাটি অতীতে নানা ক্ষয়, ডেসরাপশন আর বেদনার মধ্যে দাঁড়িয়েও, 'সম্প্রীতি'-র মতো কোনো সস্তা বা আলগা শব্দ ব্যবহার না করেই, একটা অখণ্ড সাংস্কৃতিক জমিন ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। ক্ষমতাবিন্যাসের সামনে তা ছিল আলগোছে এক বিদ্রোহ।

টীকা

১. রচনাটি ঠিক লিখিত রচনা নয়, এর নাম বচনা হওয়াই ঠিক। মোবাইল ফোনে নিজের কথা রেকর্ড করে তাকে শ্রুতিলিখন করে প্রাথমিক খসড়া বানানো। তারপর কিছু পরিমার্জনার কাজ। কিছু তথ্যভ্রান্তি মেরামতি করা হয়েছে, লেখ্যসম্পাদনার সময়ে; তেমনি কিছু

অমনোযোগজনিত কথ্য বাক্যবিন্যাসের খারাপ-দশাকে ঠিক করা হয়েছে। রচনাটির আদিসূত্র ইউট্যুবের একটা 'কমেন্ট' থেকে। পড়ে ভারতের এক সম্পাদক সোমনাথ শর্মা সেটাকে বিশদ করতে বলেন, কখনো প্রকাশ করবেন বলে। আমার মোবাইলকণ্ঠকে তিনি শ্রুতিলিখনও করেছেন, তাঁর এই সম্পাদকীয় নিষ্ঠার জন্যও তিনি আরেকবার কৃতজ্ঞতা পাবেন। তবে পারিবারিক দুর্যোগের মধ্যে তিনি আর তাঁর পত্রিকা সমেত আগাতে পারেননি। এদফা, শব্দসংখ্যা কমাতে গিয়ে আরও কিছু পরিমার্জনা হয়েছে।

২. এই রচনা বা কথ্য-রচনাটির কাল আর প্রকাশের কাল ভিন্ন। এর ভাবনাসূত্র তৈরি হবার কাল আরও প্রাচীন। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন হওয়াতে এবং সেখানে বিজেপি জিতে যাওয়াতে কিছু বিষয় বদলগুলোর সাথে মানানসই করে পাঠ করতে হবে।

৩. ফনোগ্রাফ থেকে গ্রামোফোন হবার প্রযুক্তি, কিংবা ব্রিটেনের দ্য গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে আমেরিকান কলাম্বিয়ান ফোনোগ্রাফ কোম্পানি সংযুক্ত হয়ে ইলেক্ট্রিক এন্ড মিউজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি (ইএমআই) হয়, সেসব নিয়ে এমনকি সতর্কভাবে গুগল করেও অনেক তথ্য পেতে পারেন। এই রচনায় সেই ইতিহাসের পুংখানুপুংখতা খুঁজবার আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। তবে এই তথ্যটা প্রাসঙ্গিক যে ব্রিটেনের কারখানাতে 'গান' উৎপাদন আর কলকাতার কারখানাতে 'গান' উৎপাদন প্রায় কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছে। ১৯০৮। বলা বাহুল্য যে, খোলাবাজারে ব্যাপকহারে পণ্য সরবরাহের জন্য আরও কিছু বছর লেগেছে।

৪. গানটা সহজে মনে করে থাকি না কেন, বাস্তবে অনন্তবালা বৈষ্ণবীর নামটা আমি কথ্য-রচনার সময়ে হাতড়াচ্ছিলাম। লেখ্যসম্পাদনার সময়ে ঠিক করে দিলাম। ইউট্যুবে গানটা পাওয়া যায়। এই পাওয়া যাবার ব্যাপারটাও প্রাযুক্তিক নতুন বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত তাহলে। যে আপলোডটা আমি শুনলাম সেখানে আপলোডকারী জানাচ্ছেন ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সালের কোনো এক সময়ে এটা রেকর্ড করা হয়েছিল; ইউট্যুব লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=j5qhckyxV_k

৫. এই গানটার বেলায় আবার শিল্পীর নাম মনে করতে সমস্যা হয়নি, কথ্য-রচনাটিতে ছায়াছবিটাকে ভুল করে *স্টার* ভাবছিলাম। একই বছর বা কাছাকাছি সময়ে কুমার গৌরব আর রতি অগ্নিহোত্রী অভিনীত আরেকটা আলোচিত ছায়াছবি। মীনাক্ষী এবং জ্যাকি শ্রফ স্টারার হিরো আর স্টার দুইভাবে এর গানের জন্য অত্যধিক আলোচিত ছিল। এখন আবার গুগলগিরি করতে গিয়ে আরেকটা শ্লেষাত্মক সত্যের মুখোমুখি হই। রেশমা, এই গানের শিল্পী, জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালে, এবং বর্তমান ভারতের রাজস্থানে। ছায়াছবির দৃশ্যসংবলিত গানটার ইউট্যুব লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=8BvM1BEzDS8

৬. ১৯৬৭ সালে ২৪ বছর বয়সে ভিমির প্রথম ছবি মুক্তি পায়। *হামরাজ*। রাজকুমার আর সুনীল দত্ত এই দুজন প্রতিষ্ঠিত মহাতারকা তখন তাঁর ডেব্যুকারী নায়িকার জোড়ানায়ক। এর অর্থ সংশ্লিষ্ট সকলেই বুঝবেন। ছবিটা বাণিজ্যিকভাবে সফল হওয়া ছাড়াও সেরা ছবির জাতীয় পুরস্কার জিতে নেয়।